কোটা সংস্কার আন্দোলন ২০১৮ : ঘটনাপ্রবাহ

রাহাতিল আশেকান

কাজের খোঁজে অস্থিরতা, হতাশা আর ক্ষোভ থেকেই কোটা সংস্কার আন্দোলন দেশজুড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে। সরকার এবিষয়ে কোনো যুক্তিসঙ্গত আলোচনা ও সমাধানের পথ না খুঁজে প্রতারণা ও নিপীড়নের পথ বেছে নিয়েছে। সম্প্রতি ছাত্রলীগের আক্রমণ, পুলিশের মামলা ও নির্যাতন, আদালতের রিমান্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিপীড়ক বান্ধব অবস্থান গ্রহণে বিষয়টি এক জটিল আকার ধারণ করেছে। এসবের সাথে যোগ হয়েছে নারী শিক্ষার্থীদের ওপর যৌন আক্রমণ। প্রতিদিনই নতুন নতুন হামলা যোগ হচ্ছে, শহীদ মিনারে ছাত্রলীগ একাধিকবার আক্রমণ করেছে, শিক্ষকরাও তাদের হামলা থেকে রক্ষা পায়নি। এই লেখায় এই আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী উপস্থিত করা হয়েছে।

একটা কুঁড়ি বারুদগন্ধে মাতাল করে ফুটবে কবে
সারা শহর উথাল পাথাল ভীষণ রাগে যুদ্ধ হবে।
-নবারুণ ভট্টাচার্য

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরবর্তী ২৩ বছরের ইতিহাস তীব্র শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার আখ্যান। আমরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার যুগ থেকে তখন এসে পতিত হলাম পাকিস্তান পর্বে। পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরশাসকরা পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর যত প্রকারে সম্ভব–অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জুলুম-অত্যাচারের শাসন কায়েম করল। এই শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলের জনমানসে ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদ, যার পূর্ণ রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে। আমাদের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে নানাবিধ কারণ; তন্মধ্যে মুখ্য ছিল অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা। দুই যুগেরও অধিক সময়ব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক আর্থিক বঞ্চনার স্মৃতি স্বাধীনতার সংগ্রামকে বেগবান করে। ফলে আমরা অর্জন করি একটি স্বাধীন ভূখণ্ড এবং একটি নতুন রাষ্ট্র, যার প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল অর্থনৈতিক বন্দিত্বের নিগড় থেকে তার জনগণের মুক্তিদান।

কিন্তু স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও আমরা দেখি, জনগণ তার কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ পায় না। উল্টো পথে এগোয় তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্ন। প্রতিনিয়ত মাথার ওপরে চেপে বসতে থাকে বেকারত্বের অভিশাপ। নিরাপত্তাহীন বেসরকারি খাতের প্রভাবে তরুণরা ঝুঁকতে থাকে সরকারি চাকরির দিকে। অর্থ, নিরাপত্তা ও ক্ষমতার স্বপ্নে বুক বাঁধে তারা। কিন্তু সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করে এক প্রবল বৈষম্য ব্যবস্থা। কোটার মাধ্যমে প্রায় ৫৬ শতাংশ নিয়োগে প্রবলভাবে অবমূল্যায়ন ঘটে তাদের মেধা ও স্বপ্নের। সেই স্বপ্নভঙ্গের কষ্ট বুকে নিয়ে তারুণ্য তাই নেমে আসে রাজপথে।

আন্দোলন: ৮ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল

কোটাভিত্তিক নিয়োগনীতি সংস্কারের দাবিতে এ বছরের শুরু থেকে আন্দোলন চলছিল। পাঁচ দফা দাবির মধ্যে অন্যতম হল কোটায় নিয়োগ ৫৬ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা, শূন্য পদে মেধাতালিকা থেকে নিয়োগ, সরকারি চাকরিতে সকলের জন্য অভিন্ন বয়সসীমা। এ আন্দোলনটি ছিল ক্ষুদ্র ও নানা অর্থে অসংগঠিত। তাই সরকার তাদের দাবিকে সে সময় গুরুত্বের সাথে আমলে নেয়নি।

তবে এ সমস্ত সমীকরণের পরিবর্তন ঘটে ৮ এপ্রিল। এদিন বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের (সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে গঠিত; পরবর্তীতে এ প্রবন্ধে 'পরিষদ' নামে অভিহিত) ব্যানারে ৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগারের সম্মুখ থেকে বিশাল মিছিল নিয়ে বের হয়। তারা টিএসসি-নীলক্ষেত-কাঁটাবন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে জমায়েত হয় শাহবাগ মোড়ে। চৌরাস্তার সংযোগস্থলে জড়ো হয়ে তারা চতুর্দিকের যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। দুপুর থেকে তাদের অবস্থান কর্মসূচি চলতে থাকে। বিকাল গড়ালে দেখা যায়, শাহবাগ মোড়ে এসে জমা হচ্ছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও জলকামানের ট্যাংক। তারা আন্দোলনকারীদের সরে যেতে বললেও আন্দোলনকারীরা তাদের অবস্থানে অনড় থাকে।

এ রকম পরিস্থিতিতে আনুমানিক রাত ৮টায় আন্দোলনকারীদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ বাহিনী। মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিণত হয় এক রণক্ষেত্রে। তাদের দিকে উপর্যুপরি ছররা গুলি ও কাঁদুনে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করা হয়। জলকামান থেকে ছিটানো গরম জলের তোড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ভেতরে পিছু হটে।

বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা জড়ো হতে থাকে সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে। প্রতিদিনকার সাড়ে ৯টার কারফিউ অগ্রাহ্য করে বেগম রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল ও বেগম সুফিয়া কামাল হলের গেট ভেঙে বেরিয়ে আসে অসংখ্য শিক্ষার্থী। উচ্চকিত স্লোগানে বাতাস ভারী হতে থাকে।

শিক্ষার্থীরা এক পর্যায়ে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেয়। তারা পুলিশি হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে ভিসির কাছে জবাবদিহি দাবি করে। তখন সেখানে উপস্থিত ছিল সহস্রাধিক শিক্ষার্থী। রাত আড়াইটা নাগাদ নীলক্ষেতের দিক থেকে হঠাৎ 'জয় বাংলা' চিৎকার দিতে দিতে ছাত্রলীগকে ধেয়ে আসতে দেখা গেলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়। ছাত্রলীগের ছেলেদের হাতে লাঠিসোটা, চাপাতি প্রভৃতি অস্ত্র ছিল। তারা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলে পড়ে তাদের ছত্রখান করে দেয়। এ সময় ছাত্রলীগের মিছিল থেকে একাধিকবার বন্দুকের গুলি ছোড়া হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।[১]

আন্দোলনকারীরা যখন এদিক-ওদিক ছুটে পালাচ্ছে, সে সময় মুখোশধারীদের একটি দল উপাচার্যের বাসভবনে অতর্কিত হামলা চালায়। সিসিটিভিগুলো ধ্বংস করে তারা বাসভবনের ভেতরে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ ঘটায়। পরবর্তীতে এ ঘটনাটি গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। স্বাভাবিকভাবে অভিযোগের তীর ধেয়ে যায় আন্দোলনকারীদের দিকে। তবে এটি দুর্বোধ্য নয় যে উপাচার্যের বাসভবনে হামলায় আন্দোলনকারীদের প্রকৃত কোনো উদ্দেশ্য সফল হয় না; বরং তাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। সে কারণে এ হামলাটি যে দুর্বৃত্তদের বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা সহজেই অনুমেয়।

পুলিশ ও ছাত্রলীগের যৌথ তাণ্ডবলীলা চলে রাতভর। উপাচার্যের বাসভবনের সামনে যুগপৎ আক্রমণের শিকার হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটতে ছুটতে আন্দোলনকারীদের একটি বড় অংশ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের

(টিএসসি) প্রাঙ্গণে আটকা পড়ে। তারা সেখান ভোররাত অবধি আবদ্ধ থাকে। ইতোমধ্যে পুলিশ ও ছাত্রলীগ বহুলাংশে ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

৮ এপ্রিলের ধ্বংসলীলা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মনে হয় এক বিধ্বস্ত যুদ্ধক্ষেত্র। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগের একটি সূত্রানুসারে সেই রাতে প্রায় ১১০ জন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়।[২]

পরবর্তী দিনগুলোতে আমরা আরও জানতে পারি লোকপ্রশাসন বিভাগের ছাত্র আশিকুর রহমানের কথা, ছাত্রলীগের ধাওয়া খেয়ে ছুটে যাওয়ার সময় যাঁর বুকে এসে বেঁধে একটি বুলেট; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র মোঃ শাহরিয়ার হোসেন ও মোঃ তানভির হাসানের কথা–পুলিশের ছররা গুলির স্প্লিন্টারের আঘাতে যাদের পিঠ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।[৩]

পরদিন ৯ এপ্রিল। গতরাতের ঘটনাবলি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে। ফল হয় অভূতপূর্ব। সকালে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে পরিষদের নেতৃবৃন্দ বিগত দিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। সম্মেলন শেষে তাঁরা রাজু ভাস্কর্যের সামনে জড়ো হন। বেলা বাড়তে থাকলে সকল আবাসিক হল ও শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা ছুটে আসে। এদিন পুলিশ প্রাথমিকভাবে টিএসসি অর্ধচন্দ্র চত্বরে অবস্থান নেয়। কিন্তু আন্দোলনকারীরা ধাওয়া দিলে তারা শেষাবধি দোয়েল চত্বরের নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়। এদিকে সমাবেশের আয়তন বাড়ে; মুহুর্মুহু স্লোগানে প্রকম্পিত হতে থাকে সমগ্র ক্যাম্পাস : 'ক্যাম্পাসে হামলা কেন?/প্রশাসন জবাব চাই', 'সন্ত্রাসীর কালো হাত/ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও', 'বঙ্গবন্ধুর বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই' এবং 'কোটা/সংস্কার'।

আন্দোলন ক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সহযোদ্ধাদের সাথে একে একে যোগ দেয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে বরিশালের ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ, চাঁদপুর সরকারি কলেজ, পুরানবাজার কলেজ, আনন্দমোহন কলেজসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা।

দুপুর আড়াইটা নাগাদ সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেয়া হয়। সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে ২০ জন ছাত্র প্রতিনিধি সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সাথে বৈঠকে বসেন। এই গোলটেবিল বৈঠকে সরকার কোটা ব্যবস্থা পুনর্মূল্যায়নের জন্য ৭ মে পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিকট সময় চায়। ছাত্র প্রতিনিধিরা প্রাথমিকভাবে সচিবালয়ে তাঁদের সম্মতি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে ৭ মে পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি বৃহৎ অংশ সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দাবি জানায়।

এ রকম বাদ-প্রতিবাদ চলতে থাকলে পরিষদের নেতৃবৃন্দ একে একে আন্দোলনস্থল ত্যাগ করেন। তখনও শতাধিক আন্দোলনকারী অবস্থান নিয়ে আছে টিএসসি এলাকাজুড়ে। গতদিনের মতো ছাত্রলীগের ক্যাডাররা এদিনও মল চত্বরে জড়ো হচ্ছে। গুজব ছড়ায় যে তারা অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছে। কবি জসীমউদ্‌দীন হলের ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক আবু বাসিতের ফেসবুক পোস্ট থেকে আমরা এই ক্যাডারদের হিংস্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি।

এ অবস্থায় দ্রুত প্রয়োজন ছিল আন্দোলন সেদিনের মতো স্থগিত করে আন্দোলনরতদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া। কিন্তু পরিষদ নেতৃবৃন্দ কেউ না থাকায় ওই মুহূর্তে এক ধরনের নেতৃত্ব সংকট তৈরি হয়। গণমাধ্যমের কর্মীরাও মুখপাত্র কাউকে না পেয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করার হুমকি দেয়। এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অধিকতর ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে কিছু জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থী আলোচনা করে অতিদ্রুত কতগুলো সিদ্ধান্ত নেন। এর মধ্যে প্রধান সিদ্ধান্তগুলো ছিল পরিষদের আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান ও আগামীকাল থেকে আন্দোলন চলমান রাখা।

সিদ্ধান্তটি গণমাধ্যমের সামনে ঘোষণা দেন বিপাশা চৌধুরী, যিনি ঘটনাক্রমে একটি বেসরকারি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের (ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি) শিক্ষার্থী। পরবর্তীতে তাঁর এবং সংশ্লিষ্ট আরও কজনের বিরুদ্ধে 'নেতৃত্বহরণ' ও আন্দোলন নিয়ে 'রাজনীতি' করার অভিযোগ আনা হয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে অভিযোগটি অসার। বিপাশা চৌধুরীর নতুন নেতৃত্ব গঠনের কোন ধরনের প্রচেষ্টা দুর্লক্ষ্য ছিল।

১০ এপ্রিল আন্দোলন অন্যদিকে মোড় নেয়। গতদিনে সচিবালয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদ সকালবেলা একটি সংবাদ সম্মেলন করে। সেখানে তারা সরকারের প্রস্তাব মেনে নিয়ে আন্দোলন স্থগিত করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। তবে তারা শর্ত বেঁধে দেয়, গতদিন সংসদে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী যে বিতর্কিত বক্তব্যটি দেন ("মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা সুযোগ পাবে না, রাজাকারের বাচ্চারা সুযোগ পাবে? তাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংকুচিত হবে?") তা বিকাল ৫টার ভেতরে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। অন্যথায় তারা পুনরায় আন্দোলনে ফিরে যাবে বলে জানায়। সরকারবিরোধী নানা শক্তি আন্দোলনে তৎপর বলেও তারা এ সম্মেলনে অভিযোগ করেন।

তবে গতকালের মত এদিনও আন্দোলনকারীদের একটি বড় অংশ পরিষদের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে। তাদের আপত্তির বেশ কিছু কারণ ছিল। আন্দোলনটি তখন আর শুধুমাত্র কোটা সংস্কারের দাবিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের উপর্যুপরি হামলা এবং বছরের পর বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে হলগুলোতে ও অন্যান্য পরিসরে তাদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিস্তৃত প্রতিবাদেও রূপ নিল। তদুপরি মতিয়া চৌধুরীর বক্তব্যও অনেককে ক্ষুব্ধ করেছিল।

এ পর্যায়ে আন্দোলন স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। আন্দোলনকারীদের যে অংশ পরিষদের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে তারা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে মিছিল নিয়ে এসে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে অবস্থান নেয়। ক্রমে তারা চারদিকের যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। প্রাথমিকভাবে সমাবেশটি ক্ষুদ্র থাকলেও তার আয়তন বৃদ্ধি পায়। ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে ও কোটা সংস্কারের দাবিতে স্লোগান চলতে থাকে মুখে মুখে।

১০ এপ্রিল ঢাকার বিভিন্ন অংশে অবস্থিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এদিন কোটা সংস্কার আন্দোলনে যোগ দেয়। সাতমসজিদ রোড জুড়ে এদিন সকালবেলা স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস অব বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি অব

এশিয়া প্যাসিফিক ও নর্দান ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। বসুন্ধরা-রামপুরা এলাকায়ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের অবস্থান নিতে দেখা যায়।

এদিকে রাজু ভাস্কর্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলমান। বিকাল ৫টা পার হলেও যখন মতিয়া চৌধুরী তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করেন না, তখন পরিষদ পুনরায় রাজপথের আন্দোলনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের নেতৃত্বে একটি বড় মিছিল রাজু ভাস্কর্যে অবস্থানরত আন্দোলনকারীদের সাথে এসে যোগ দেয়। সরকারের পক্ষ থেকে কোটা সংস্কারের সুনির্দিষ্ট কোন ঘোষণা আসার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে আন্দোলন ও লাগাতার ধর্মঘট কর্মসূচির ডাক দেয়া হয়। এ উপলক্ষে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান জানায়। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ এদিনের মত সমাবেশ স্থগিত করা হয়।

তবে প্রতিমুহূর্তে নতুন ঘটনা-দুর্ঘটনার উৎপত্তি ও বিস্তার তখনও শেষ হয়নি। ১০ এপ্রিল দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় খবর ছড়িয়ে পড়ে যে কবি সুফিয়া কামাল হলে আন্দোলনকারীদের নির্যাতন করা হয়েছে। অনলাইনে বহুল প্রচারিত একটি অডিও ক্লিপ থেকে শনাক্ত করা যায় যে ছাত্রলীগের হল ইউনিটের সভাপতি ইফফাত জাহান এশা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য কয়েকজন শিক্ষার্থীর ওপর চড়াও হয়েছেন। গুজব ছড়ায় যে এশার আঘাতে আন্দোলনকারীদের একজনের পায়ের রগ ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে পরিষ্কার হয়, রক্তাক্ত পাটি মোর্শেদা খানমের, এশা হুমকি দিতে থাকলে যিনি ক্রোধে একটি জানালার গ্লাসে লাথি মেরে পা কেটে ফেলেন।[৪]

কিন্তু গুজবের তাৎক্ষণিক প্রভাব সাধারণত শক্তিশালী হয়। নির্যাতনের খবর ছড়িয়ে পড়লে গভীর রাতেই ছেলেদের হল থেকে সহস্রাধিক ছাত্র বেরিয়ে এসে সুফিয়া কামাল হলের ফটকে জড়ো হয়। শিক্ষার্থীদের জোর দাবির মুখে এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ থেকে ও পরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। এই পদক্ষেপগুলো নেয়া হয় অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এবং কোন রকম আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই। তবে গুজবের প্রভাব শক্তিশালী হলেও ক্ষণস্থায়ী এবং কখনও কখনও, নেতিবাচক হয়। তাই তিন দিন বাদে ফের আমরা দেখি ফুলের মালা দিয়ে ছাত্রলীগ এশাকে পুনর্বহাল করেছে। এবং তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের নির্যাতনের যে অভিযোগ ছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধামাচাপা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও নির্লজ্জভাবে তাঁর ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দিয়েছে।

সেই রাত শেষে সকাল হতে না হতেই ছাত্রদের বিশাল মিছিল সমগ্র ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে এসে রাজু ভাস্কর্যে জমায়েত হয়। আন্দোলনে নতুন উদ্দীপনার আঁচ পাওয়া যায়। গতরাতে সুফিয়া কামাল হলে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনার প্রভাবে আন্দোলনের নিপীড়নবিরোধী ধারাটি নতুনভাবে প্রাণ পায়।

১১ এপ্রিল জাতীয় সংসদে কোটা সংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। কোটা থাকলে তা বার বার সংস্কার করতে হবে–এ রকম অজুহাত দেখিয়ে তিনি সম্পূর্ণ কোটা পদ্ধতিই বাতিলের ঘোষণা দেন। আন্দোলনে নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও ভিসির বাড়িতে হামলা নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ ও ছাত্রলীগের নৃশংস আক্রমণের ব্যাপারে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন।

প্রথম থেকেই আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল 'সংস্কারের'। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা তাদের মধ্যে দ্বিধা তৈরি করে। কোটা পদ্ধতি সংস্কার না করে, সহসা বাতিল সরকারের রাজনৈতিক কৌশল বলেই প্রতীয়মান হয়। এ কৌশলের মাধ্যমে আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এবং তা সফলও হয়।

পরদিন বৃহস্পতিবার পরিষদ সংবাদ সম্মেলন করে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ঘোষণার জন্য অভিনন্দন জানায়। তারা এ ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দ্রুত প্রজ্ঞাপন জারি, আটক শিক্ষার্থীদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং পুলিশ ও ছাত্রলীগের নির্যাতনে আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণের দাবি জানায়।

মূল আন্দোলন পরবর্তী ঘটনাবলি

কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রধান পর্বটি এখানেই সমাপ্ত হয়। পরিষদ চলতি মাসের (এপ্রিল) মধ্যে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের শর্ত দিয়ে আন্দোলন স্থগিত করে। শিক্ষার্থীরা তখনকার মত ঘরে ফিরে গেলেও সরকারের পক্ষ থেকে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। ১৬ এপ্রিল একটি সংবাদ সম্মেলন শেষে চানখাঁরপুল যাওয়ার পথে পরিষদের তিনজন নেতাকে–যুগ্ম আহ্বায়ক নূরুল হক নূর, ফারুক আহমদ ও রাশেদ খানকে–সাদা পোশাকধারী ব্যক্তিরা তুলে নিয়ে যায়।[৫] পরিষদের অভিযোগ, তারা ছিল পুলিশের গোয়েন্দা শাখার সদস্য। পরবর্তীতে সামাজিক ও গণমাধ্যমে তাঁদের আটকের খবর ছড়িয়ে পড়লে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের মুখে ওই দিনই তাঁদের ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু তাঁদের ওপর পুলিশ নজরদারি বজায় রাখে। যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদ খানের বিরুদ্ধে জামায়াত-শিবিরের সাথে রাজনৈতিক সংশিষ্টতার অভিযোগ এনে তাঁর গ্রামনিবাসী পিতাকেও জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন করা হয়। এতে তাঁদের সকলের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হুমকিতে পড়ে।[৬]

পরবর্তীতে ২০ এপ্রিল ইফফাত জাহান এশার ঘটনার জের ধরে গভীর রাতে সুফিয়া কামাল হল থেকে বেশ কজন ছাত্রীকে প্রশাসন হল ত্যাগ করতে বাধ্য করে। হল প্রাধ্যক্ষ তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের অভিযোগ আনে। এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে স্যার এ এফ রহমান হলের আবাসিক ছাত্র ইয়াসিন আরাফাত অন্তরকেও হলের প্রবেশপথ থেকে বিদায় করে দেয়া হয়। এর প্রতিবাদে পরদিন পরিষদের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা হলে ছাত্রীদের ফিরিয়ে নেয়া এবং প্রাধ্যক্ষের পদত্যাগ চেয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। ফলে ওই দিনই বিতাড়িত ছাত্রীদের হলে ফিরিয়ে নেয় প্রশাসন।

চলতি মাসের মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারির কথা থাকলেও সরকার টালবাহানা করতে থাকে। পরিষদ সরকারের সাথে কয়েক দফায় বৈঠকে বসে সর্বশেষ ১৩ মে পর্যন্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশের ডেডলাইন দেয়। তা-ও না করা হলে ১৪ মে সারা দেশে ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। তবে সেশনজট ও রমজান মাসের কথা বিবেচনা করে ১৯ মে ক্লাস বর্জন কর্মসূচি অব্যাহত রেখে পরীক্ষা বর্জন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এর মধ্যে আড়াই মাস পেরিয়ে গেলেও দেখা যায়, সরকারের পক্ষ থেকে নামমাত্র অগ্রগতি হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ জুন পরিষদ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে একটি সংবাদ সম্মেলনের ডাক দেয়। কিন্তু সে সম্মেলন শুরু হওয়ার পূর্বেই ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা হামলা করে তা পণ্ড করে দেয়। তারা যুগ্ম আহ্বায়ক নূরুল হক নূরকে বেধড়ক পেটায় এবং আরও সাতজনকে মারাত্মকভাবে আহত করে।

একদিন পর সোমবারও ছাত্রলীগ পুনরায় হামলা চালায়। শহিদ মিনারে পতাকা সমাবেশে অল্প কজন আন্দোলনকারীর ওপর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা একেকজন শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধভাবে পেটায়। গণমাধ্যমে আসা একটি ছবিতে দেখি যে তারা একজন নারী শিক্ষার্থীকেও নিতান্ত পাশবিকভাবে আক্রমণ করে। এদিন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও পরিষদের একজন যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলামকেও মিছিলের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে নিদারুণভাবে পেটায় ছাত্রলীগের জনা কয়েক সদস্য। ওই সময় দেখা যায়, ছাত্রলীগের নেতা আব্দুলাহ আল মামুন হাতুড়ি দিয়ে পেরেক পোঁতার মত পৈশাচিকভাবে তরিকুলের শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করছেন। তাতে তাঁর ডান পায়ের দুটি হাড় ভেঙে যায় এবং মাথায় আটটি সেলাইয়ের প্রয়োজন হয়।[৭]

এসব হামলায় পরিষদের আহত নেতারা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলে বেশ কটি হাসপাতাল তাঁদের চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নানা ধরনের অভিযোগ দেখিয়ে নেতাদের আটক করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের সূত্রানুসারে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চারটি মামলায় মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৮] আতঙ্কগ্রস্ত বাকিরা কেউ কেউ আত্মগোপনে চলে যান। কেউ কেউ স্রেফ নিখোঁজ হয়েছেন।

ছাত্রলীগের অব্যাহত হামলার প্রতিবাদে এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পুনরায় সংগঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা নেয়। তাদের সাথে যোগ দেন সম্মানিত কিছু শিক্ষক। তাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও এই দুঃসময়ে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সাহস ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য যথেষ্ট হন। সরকার এদিকে নানাভাবে আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালিয়ে যায়। ৩ জুলাই প্রেস ক্লাবে (ঢাকা) উদ্বিগ্ন অভিভাবক ও নাগরিকদের একটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বাধা দিয়ে পুলিশ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেহনুমা আহমেদ ও ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি বাকী বিলাহকে গ্রেপ্তার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফাহমিদুল হক পুলিশকে গ্রেপ্তারে বাধা দিতে গেলে তাঁকেও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। অবশ্য প্রবল প্রতিবাদের মুখে পুলিশ কিছুক্ষণ বাদেই তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে এবং সর্বোপরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ভূমিকা রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোঃ আখতারুজ্জামান ও প্রক্টর গোলাম রব্বানি। তাঁরা এপ্রিলে শিক্ষার্থীদের ওপর প্রথম আক্রমণের দিন থেকে নানাভাবে তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে লঘু করার অপচেষ্টা তাঁরা সব সময় করে চলেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেয়া তাঁদের বক্তব্য সরকার-অন্তপ্রাণ দলদাসদেরও হার মানিয়েছে। তাঁদের এই দায়িত্বজ্ঞানহীন, নির্লজ্জ আচরণের জন্য ইতিহাসের পাতায় দুটি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নাম হয়ে থাকবেন।

কোটা সংস্কারের আন্দোলন একটি যৌক্তিক ও ন্যায্য আন্দোলন। মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা ও সরকারবিরোধী বলে বার বার এ আন্দোলনের বৈধতা হরণের চেষ্টা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে কোটা সংস্কারের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রকৃত বাস্তবায়নের দিকেই আমরা একধাপ এগিয়ে যাব। সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটায় নিয়োগ দিয়ে মেধার যে অবমূল্যায়ন ঘটানো হচ্ছে, তার সমাধান চাইতেই তরুণরা পথে নেমেছে। এই কোটা সংস্কার আন্দোলন শুধু সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেই নয়, বরং আরও বৃহৎ পরিসরে কর্মসংস্থান সংকটের দিকেই আমাদের নজর ফেরায়। সরকারের এই মুহূর্তে উচিত হবে তরুণদের দাবি মেনে নিয়ে কোটার প্রয়োজনীয় সংস্কার করা ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীগুলোকে কার্যকর সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সমবিকাশের সুযোগ করে দেয়া; এবং সর্বোপরি দেশে যে ৪ কোটি ৮২ লাখ কর্মহীন মানুষ ও ২৬ লাখ ৮০ হাজার বেকার রয়েছে তাদের জন্য সত্বর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। অন্যথায় মুক্তিযুদ্ধ আমাদের যে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিল তা অনার্জিত থেকে যাবে।

রাহাতিল আশেকান : শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : rahatilrahat@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. 'ক্যাম্পাস যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র', প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০১৮
২. 'মাথায় ব্যান্ডেজ, রক্তাক্ত শরীর', প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০১৮
৩. 'আশিকুরের বুকে কার গুলি?', প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০১৮
৪. 'রগ কাটা'র গুজব নিয়ে যা বললেন মোর্শেদা', বাংলা ট্রিবিউন, ২০ এপ্রিল ২০১৮
৫. 'কোটা সংস্কার আন্দোলনের তিন নেতাকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ', বাংলা ট্রিবিউন, ১৬ এপ্রিল ২০১৮
৬. 'আতঙ্কে রয়েছেন কোটা আন্দোলনের চার শীর্ষ নেতা', বিবিসি বাংলা, ১৬ এপ্রিল ২০১৮
৭. "হাতুড়ির আঘাতে 'জীবনের আশা ছেড়ে দেওয়া' তরিকুল!", ডেইলি স্টার, ৫ জুলাই ২০১৮
৮. 'কোটা আন্দোলনের নেতারা গ্রেপ্তার আতঙ্কে, নতুন কর্মসূচি নেই', প্রথম আলো, ৮ জুলাই ২০১৮